নিবেদিতার বাড়ি : একটি ঐতিহাসিক দলিল

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

তাঁর মহাবিশ্বে কিছু হারায় না। কোনও কোনও স্মারক জাগ্রত, জীবন্ত হয়ে স্মৃতির সরণি বেয়ে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে সুদূর অতীতে। শুধু দেখার চোখ চাই, শোনার কান চাই, আর অনুভব করার হৃদয় চাই। বোসপাড়া লেনের ১৬ নম্বর এবং ১৭ নম্বর বাড়ির কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে অনুভবের মন নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ধ্যানের গভীরে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাওয়া যাবে সেই অতীতে যেদিন ১৮৯৮ সালের নভেম্বরের এক সকালে এই গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এক বিদেশিনী এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই রচিত হতে শুরু হয়েছিল ভারতবর্ষের এক নতুন ইতিহাস, এই গৃহদুটিকে কেন্দ্র করে।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় নিবেদিতার এই বাড়িটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে : ''তাঁর বাড়ি চমৎকার এক মিলনক্ষেত্র।... আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আর কোথাও এত সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ ছিল না। এখানে [গভর্নর জেনারেলের] কাউন্সিলের সদস্যগণের, সেইসঙ্গে কলকাতা ও বাংলাদেশের নাগরিক জীবনের নেতৃগণের সাক্ষাৎ মেলে যাঁদের নাম ও কার্যের সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রচারিত; ভারতীয় শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বক্তা, সাংবাদিক, ছাত্র, প্রায়শ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কোনও পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, মাঝে-মধ্যে ভ্রাম্যমাণ পণ্ডিত, এবং অবিরত দূরপ্রদেশসমূহের ধর্মনেতা বা জননেতা হাজির।''

আর যাঁকে কেন্দ্র করে এই সমাবেশ সেই নিবেদিতার দিন কেমন কাটত বাড়িটিতে? ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রবুদ্ধ ভারত পত্রিকায় লেখা হয়েছে : ''একেবারে প্রভাতকাল থেকে উত্তীর্ণ-সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ে দেখা যেত তিনি কঠোর পরিশ্রমে নিমগ্ন—হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন ভারতের ইতিহাস, পুরাণ, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম, শিল্প, দর্শনের উপরে... যদি তা জাতীয় চৈতন্যসৃষ্টির প্রয়োজনে লাগে।''

এই ইতিহাস সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল একটি ছোট বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্য দিয়ে। স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতে এসেছিলেন নিবেদিতা মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য। নারীশিক্ষার প্রচলন তখন ভারতবর্ষে সদ্য শুরু হয়েছে এবং তাও খুবই মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে। মিশনারি পরিচালিত স্কুলগুলিতে প্রধানত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য ছিল। সম্পূর্ণ

অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন

জাতীয় ধারায়, দেশীয় সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে এমন কোনও বিদ্যালয় তখনও মেয়েদের জন্য স্থাপিত হয়নি যেখানে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দুরা তাঁদের কন্যাকে নির্ভয়ে পাঠাতে পারেন। সেই দুঃসাধ্য কাজটিই শুরু করলেন নিবেদিতা, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে। একজন সাদা চামড়ার মেমসাহেব আরম্ভ করলেন ভারতীয় ধাঁচে স্কুল। ভারতীয়দের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য তাঁকে কত শ্রম, কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল সেসব কাহিনি প্রায় কল্পকথার মতন। কিন্তু সব সত্য ঘটনার সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে বোসপাড়া লেনের বাড়ি দুটি।

১৩ নভেম্বর সেই সুপ্রভাতে স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে স্বয়ং শ্রীমা সারদা দেবী পূজা করে বিদ্যালয়ের শুভসূচনা করেন। উচ্চারণ করেন এক অমোঘ আশীর্বাণী : ‘‘আমি প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয়, এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে।’’ মায়ের এই কল্যাণকামনায় বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা দুজনেই বিদ্যালয়টির ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত নিবেদিতা বলেছিলেন, ‘‘ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারীজাতির পক্ষে শ্রীমার আশীর্বাদ অপেক্ষা কোনও মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করতে পারি না।’’

পরদিন বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কাজ আরম্ভ হল। সেদিনও এসেছিলেন স্বামীজী। পাড়ার কয়েকটি ছোট ছোট মেয়ে হল ছাত্রী। স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষেরাই প্রথমে তাঁদের কন্যাদের স্কুলে পাঠানো শুরু করেন।

নারীশিক্ষার সূত্রেই নিবেদিতা পরিচিত হন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে। তখন ব্রাহ্মরা নারীশিক্ষার কাজে এগিয়ে আসছেন। ব্রাহ্ম মহিলারাই প্রথম পর্দানশীনতার ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে শিক্ষার আলোর দিকে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল। এসব শিক্ষামূলক কাজে তখন ঠাকুর পরিবার যথেষ্ট অগ্রণী ছিল। নিবেদিতার সঙ্গে এই ঠাকুর পরিবারের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। তিনি তাঁর ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যোগাযোগ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি শনিবার তাঁর বাড়ির উঠানে একটি চায়ের আসরের আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বামীজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি, মিসেস পি কে রায় (অবলা বসুর দিদি) এবং নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নিচে বসে সেদিন সকলকে গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

এরপরেও নিবেদিতার ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তিনি অনেকবার এসেছেন। ফ্রবেলের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে শিশু মনস্তত্ত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিবেদিতা কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যেভাবে স্কুল চালাচ্ছিলেন তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এরকম একটি বিদ্যালয় শুরু করতে নিবেদিতাকে অনুরোধ করেছিলেন। নানা কারণে নিবেদিতার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। পরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে-আশ্রম এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে তাঁর আদর্শকে রূপ দেন সে-বিষয়ে হয়তো তাঁদের দুজনের মধ্যে আলোচনা হত। এই গৃহই যেকোনও আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল।

নারীশিক্ষার সূত্রে নিবেদিতা পরিচিত হয়েছিলেন আর একটি ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে, যে-বন্ধুত্বের সম্পর্ক তাঁরা উভয়েই আজীবন বহন করে গেছেন। লাবণ্যপ্রভা বসু ছিলেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর বোন। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরে নিবেদিতা এবং মিসেস বুল বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরি

দেখতে যান। সেখানে অবলা বসুর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর আলোচনাও হয়। কিন্তু যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে তা হল ড. বসুর অসামান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। নিবেদিতা দেখেন তাঁর আবিষ্কারের মূল সুর ভারতীয় দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় বলেই তাঁর গবেষণার প্রতিপদে অজস্র বাধা। নিবেদিতার সহৃদয় মন বিজ্ঞানীকে যেকোনওভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত হল। আর্থিক বন্দোবস্ত তো বটেই, নিবেদিতা সরাসরি বিজ্ঞানীকে গবেষণার বিষয়বস্তুর সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে সাহায্য করতে শুরু করলেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের তিনটি বিখ্যাত বই 'Living and Non-living', 'Plant Response', 'Comparative Electro-physiology' এবং আরও বহু প্রবন্ধ নিবেদিতা শুধু সম্পাদনা করেছেন বললে ভুল হবে, ভাষার ওপর অসামান্য দখল থাকার জন্য বইগুলির ভাষাও বহুলাংশে ছিল নিবেদিতার। ড. বসু প্রায় প্রতিদিন বোসপাড়া লেনে আসতেন; বহুক্ষণ ধরে তাঁদের লেখা চলত। ১৯০৯ সালে দেবমাতা কিছুদিন এ-বাড়িতে নিবেদিতার সঙ্গে বাস করেছিলেন। তিনি লেখেন, ''ভগিনী নিবেদিতা লেখার কাজে সম্পূর্ণ মগ্ন থাকতেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. জে সি বোসের উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে নূতন পুস্তক রচনার কাজে তিনি সহায়তা করতেন, এবং তাতে বহু সময় যেত। ডক্টর বসু প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করতেন এবং কখনও কখনও সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করতেন।''

নিবেদিতার সঙ্গে অবলা বসুর সম্পর্কও ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে অবলা বসু দীর্ঘদিন সেক্রেটারি ছিলেন। নিবেদিতার স্কুলেও এসেছেন অনেকবার। একবার তাঁর সামনে ছাত্রীরা গাইছে 'বঙ্গ আমার জননী আমার', আনন্দে নিবেদিতার চোখ দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। অবলা বসু নিবেদিতাকে একান্ত আত্মীয়া বলে মনে করতেন। তিনি জানিয়েছেন, ''তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতে আমি কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল ভগিনীদের মধ্যে তাঁর শিক্ষা-প্রচেষ্টার সাফল্য সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ভরসা বোধ করতে পারিনি। এর কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে তাঁর বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে আহ্বান জানালেন। সেখানে গিয়ে চমৎকৃত। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। রক্ষণশীল পরিবেষ্টনীর মধ্যে বাড়ি নিয়েছিলেন বলে প্রথমে কোনো হিন্দু ভৃত্য তাঁর কাজ নেয় নি। তিনিও প্রতিবেশীদের ভাবে আঘাত করার চেয়ে বিনা চাকরেই রইলেন। কতবার হয়েছে, রান্না করা সম্ভব হয়নি, শুধু ফল খেয়ে কিংবা কোনও সহৃদয় প্রতিবেশী যা পাঠিয়েছেন, তাই খেয়ে দিন কাটিয়েছেন। কিছুদিন পরে সেই প্রতিবেশীরাই তাঁকে এমন আপন জন বলে মনে করল যে এমন কি সবচেয়ে রক্ষণশীল অথচ শ্রেষ্ঠা তাপসী নারীও তাঁর বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতে পেরে খুশী হলেন।... তাঁর পৌরনীতিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র রূপে অচিরে তাঁর গলি এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চল পরিচ্ছন্নতার একটি আদর্শ ছবি হয়ে দাঁড়াল। কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু তিনি নিজ হাতে পথ পরিষ্কার করে দেখালেন।''

আমাদের স্মরণ হয় কলকাতার প্লেগের কথা, যখন করুণাস্বরূপিণী হয়ে নিবেদিতা বাগবাজার অঞ্চলে ঘুরেছেন, মানুষকে আশ্বাস ও সাহস দিয়েছেন। সেসময় তিনি চেয়েছিলেন নিজের প্রাণ বিপন্ন করে নিজের বাড়িটিকে একটি হাসপাতালে পরিণত করতে, কিন্তু জনগণের হাসপাতালভীতির কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি।

মনে পড়ে যায় বৃদ্ধা গোপালের মার কথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্ত্রীভক্তদের মধ্যে তিনি ছিলেন খুব বড় সাধিকা। ১৭ নং বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তিনি দীর্ঘ আড়াই বছর কাটিয়েছেন। এই

তপস্বিনীকে নিজের কাছে রাখতে পেরে নিবেদিতা খুব আনন্দিত ছিলেন। মিস ম্যাকলাউডকে প্রতি চিঠিতে গোপালের মার কথা লিখতেন। ‘‘গোপালের মা এখানে আছেন, আমার যে কী আনন্দ! স্বামী সারদানন্দ বলছেন, তিনি (গোপালের মা) আমাদের কাছেই বরাবর থাকবেন—আমার আদরের ছোট ঠাকুমা।’’ এই উচ্চস্তরের সাধিকার উপস্থিতিতে তাঁর বাড়ি যে মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে সেটা অনুভব করার মতো উন্নত মন নিবেদিতার ছিল।

ইতিমধ্যে তাঁর বিদ্যালয়ের কাজে সাহায্য করার জন্য বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেছেন স্বামীজীর আর এক পাশ্চাত্য শিষ্যা ক্রিস্টিন। মাঝখানে কিছু সময় বিদ্যালয়ের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে নিবেদিতা গিয়েছিলেন পাশ্চাত্যে। সে সময়, ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ১৬ নং বাড়িটি তিনমাসের জন্য আবার ভাড়া নেওয়া হয়। শ্রীমা সারদা দেবী এবাড়িতে তখন বসবাস করেন। পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে ১৭ নং বাড়িটি ভাড়া নেন নিবেদিতা। আবার স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজীর দেহাবসান হল। সেই দুরপনেয় শূন্যতাকে সরিয়ে নিবেদিতা শুরু করলেন সারা ভারত জুড়ে বক্তৃতা সফর। ভগিনী ক্রিস্টিন তখন স্কুলের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯০৩-এর ২৭ জানুয়ারি থেকে নিবেদিতা আবার নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করেন। একইসঙ্গে চলতে থাকে বহুভাবে ভারত জাগরণের কাজ। যেখানে এতটুকুও ভারতের গৌরব, ভারতের উত্থান বা স্বাধীনতার প্রসঙ্গ দেখেছেন, সেখানেই সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সাহায্য তাঁর দৃষ্টিতে ছিল ভারত উপাসনা।

দীনেশচন্দ্র সেন বাগবাজারে বোসপাড়া লেনেই থাকতেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট ইতিহাস রচনা করেন। নিবেদিতাকে তাঁর বইটি দেখে দিতে অনুরোধ করায় নিবেদিতা সাগ্রহে সেই বইটি প্রায় বছরখানেক ধরে দেখে দেন। কোনওদিন সেই বাড়িতে বসে সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দুজনে মিলে খেটেছেন। মধ্যে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য খেয়ে নিয়েছেন মাত্র।

প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একইভাবে নিবেদিতা বহু লেখা দিয়ে তাঁর পত্রিকা সচল রাখতে সাহায্য করেছিলেন। আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘লেখার অভাব যাতে না হয় সে চেষ্টা হবে।’’ রামানন্দবাবু স্মৃতিচারণ করেছেন : ‘‘ভারতীয় দেশী জিনিসের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। একবার তিনি আমাকে তাঁহার সহিত প্রত্যুষেই দেখা করিতে বলিলেন। বোসপাড়া লেনে তাঁহার সেই জীর্ণ বাড়িতে গিয়া খবর দিতেই তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। দেখিয়াই বুঝিলাম, তিনি পূজাপাঠ ও জপ করিতেছিলেন। পরে নিচে আসিয়া উভয়ে জলযোগ করিলাম। তিনি আমাকে পনীর খাইতে দেওয়ায় বলিলাম, তাহা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। তিনি বলিলেন, ‘খান; ইহা ঢাকার তৈরি, বিদেশি নয়।’ এইরূপে দেশী বলিয়া আমাকে কিছু নতুন খেজুর গুড়ও খাইতে হইল। তিনি কোথায় একটি আধ-পয়সা দামের কালো মাটির প্রদীপ পাইয়াছিলেন। তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহা যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়াছিলেন।’’

নিবেদিতা ছিলেন জন্মশিল্পী। ভারতের শিল্পকলা যাতে সঠিক জাতীয় ভাব অনুসরণ করে প্রবাহিত হতে পারে সেদিকে ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ নজর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, কুমারস্বামী সকলেই তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। বারে বারে গিয়েছেন তাঁরা নিবেদিতার গৃহে। একদিন নন্দলাল বসু এবং তাঁর শিল্পী বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন বোসপাড়া

সংস্কারের পর ১৬ নং বাড়ি

পোলক বাগবাজারের বাড়িতে নিবেদিতার সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি লেখেন, ''আমি তাঁর বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম, অনাড়ম্বর চেহারার জায়গা; তাঁর দেখা পেয়েছিলাম, তিনি অত্যন্ত আকর্ষক, মধুর চরিত্রের মানুষ।'' পোলক বালিকাদের কাছে সাউথ আফ্রিকার কথা বলেছিলেন; তা নিবেদিতা পছন্দ করেন।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯০২ সালের আগস্ট থেকে ১৯০৫ সালের জুলাই পর্যন্ত কালপর্বকে বাংলার তথা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের 'নিবেদিতা পর্ব' রূপে উল্লেখ করেছেন। বাঘা যতীন, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে শুরু করে বহু বিপ্লবীকে নিবেদিতা নানাভাবে সাহায্য করে চলেছিলেন সে সময়ে। সে এক পৃথক ইতিহাস। মি. র‍্যাটক্লিফ জানান যে নিবেদিতার বিদ্যালয়টি বিপ্লবীদের সংবাদ চলাচলের কেন্দ্র ছিল। মিস ম্যাকলাউড বৈপ্লবিক কাজের জন্য নিবেদিতাকে অনেক অর্থ দিয়েছিলেন। নিবেদিতার বেশ কিছু 'চেলা' ছিল যারা পরস্পরকে চিনত না। কিন্তু তাদের কেন্দ্রীয় আসর ছিল নিবেদিতার বাড়ি। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ নির্বাসিত নয়জন নেতা যখন মুক্তিলাভ করেন তখন আনন্দে নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের দ্বারে পূর্ণকুম্ভ ও কলাগাছ স্থাপন করেন।

অথচ নিবেদিতার অনেক ইংরেজ বন্ধুও ছিল এদেশে, যাঁদের কারও কারও মধ্যে তিনি ভারতপ্রীতি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে 'স্টেটসম্যান' সম্পাদক মি. কে এস র‍্যাটক্লিফ, 'ইংলিশম্যান' সম্পাদক মি. এ জে এফ ব্লেয়ার, আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মি. ই বি হ্যাভেল, মি. সি এফ এন্ড্রুজ প্রভৃতি তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন, এবং অনেকেই তাঁর গৃহে প্রায়ই যাতায়াত করতেন। মি. র‍্যাটক্লিফ লিখেছেন, ''প্রতি রবিবার সকালে তাঁর

লেনে, নিবেদিতার বাড়িতে। বসবার ঘরে তাঁরা সোফায় বসলেন। মেঝেতে কার্পেট পাতা ছিল। নিবেদিতা তাঁদের বললেন, ''তোমরা নিচে নেমে বোসো।'' নেমে বসলেন ঠিকই কিন্তু তাঁদের খুব রাগ হল। নিবেদিতা অপলকে তাঁদের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ''তোমরা বুদ্ধের দেশের মানুষ, তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ভাল লাগে না। তোমরা এই যেভাবে বসেছ ঠিক বুদ্ধের মতো, ভারি ভাল লাগছে আমার দেখতে।''

এমন যে ভারতভগিনী লোকমাতা, তিনি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগী হবেন, এ তো জানা কথাই। নরমপন্থী বা চরমপন্থী দুই দলের নেতাদের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। গোপালকৃষ্ণ গোখলে কর্মপ্রয়োজনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন নিবেদিতার গৃহে। আরও কত স্বদেশি নেতাদের আনাগোনা ছিল তার বাড়িতে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, ''পরবর্তী কালে আমি মাঝে মাঝে সময় করিয়া বাগবাজারে নিবেদিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। এই সাক্ষাৎকালেই একদিন তিনি আমাকে সংবাদ দেন যে, সরকার আমাকে নির্বাসন দেওয়া স্থির করিয়াছেন।'' গান্ধিজীর সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয়েছিল চৌরঙ্গি অঞ্চলে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী

গৃহে আমরা প্রাতরাশে যোগ দিতাম। প্রাতরাশের আয়োজন ছিল অত্যন্ত সাধারণ, কিন্তু হাস্য-কৌতুক ও পরিশেষে নানারূপ আলোচনার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় চলে যেত। নিবেদিতার গৃহ ছিল চমৎকার বৈঠকখানা।... সম্ভবত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এক শীতের প্রভাতে, মি. উইলিয়াম জেনিংস সপত্নীক নিবেদিতার বাগবাজারস্থ বাড়িতে প্রাতরাশে যোগ দেন। তিনি তখন ভূপর্যটনে বার হয়েছেন, ভারত ভ্রমণকালে কলকাতায় তাঁর আগমন। সেদিনের প্রভাতটি বড় আনন্দের ছিল।"

আরও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিবেদিতার কারণে এসেছিলেন বাগবাজারের এঁদো গলিতে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টো ছিলেন ভারতের বড়লাট। তাঁর স্ত্রী লেডি মিন্টো নিবেদিতা এবং তাঁর স্কুলটির কথা শুনে সেটি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ২ মার্চ হঠাৎ মিসেস ফিলিপসনকে নিয়ে নিবেদিতার বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে আসেন। তিনি আত্মগোপন করে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর ভাষায়, "সিস্টার নিবেদিতা দেশীয় পল্লীর এক অপরিসর গলির মধ্যে ক্ষুদ্র এক বাড়িতে বাস করেন। সেখানে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে বর্তমান গোলযোগের মধ্যে বিশেষ পুলিশ প্রহরী ছাড়া আমাকে শহরের ওই অংশে যেতে দেওয়া হত না। বিদায় নেওয়ার সময় আমাকে বড়লাট পত্নী জেনে তিনি বিস্মিত হলেন। তাঁর মুখ অনিন্দ্যসুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল।"

প্রকৃতপক্ষে নিবেদিতার বাড়িটি সেই সময়ে সারা ভারতের সবরকম উন্নয়নমূলক কাজের একটি প্রধান কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হয় না। নিবেদিতার সাহায্য, প্রেরণা ও পরামর্শে তখন ভারত ও ভারতী সঞ্জীবিত হয়ে চলেছেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়নি। তাঁর গৃহটি ছিল অত্যন্ত পুরনো ও অস্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে অসহ্য গরমে তাঁর চোখমুখ লাল হয়ে যেত। মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পেতেন। দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। অথচ এরই মধ্যে চলত অবৈতনিক স্কুল পরিচালনা, অসহায়কে আর্থিক সাহায্য দান। বন্ধুরা তাঁকে বহুবার এ-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কথা বলেছেন। নিবেদিতা যাননি। কারণ এই গলি, এই বাড়ি যে তাঁকে দত্তক নিয়েছে!

বহু বছর আগের এক আয়ারল্যান্ড কন্যা—যে তার কাছে থেকে, তাকে ভালবেসে নিজের জীবনটাই দিয়ে দিল, যার মহিমায় তার ভাঙাচোরা শরীরে আজ বর্ণচ্ছটা—তাকে কি বোসপাড়া লেন আর ১৬, ১৭ নম্বর বাড়ি দুটি ভুলতে পারে? আজও তাই বাড়ির দেওয়ালে কান রাখলে হয়তো শোনা যাবে শিশুদের কলকাকলি অথবা সকালে প্রাতরাশের গুরুগম্ভীর আলোচনার গুঞ্জন। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা*, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল, কলকাতা, ২০০৫
২। সরলাবালা সরকার, *নিবেদিতাকে যেমন দেখিয়াছি*, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ১৪২৪
৩। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, খণ্ড ১ পর্ব ২ (১৩৯৮), খণ্ড ২ (১৩৯৪), খণ্ড ৩ (১৩৯৫)

বিজ্ঞপ্তি

* শ্রীসারদা মঠের চতুর্থ অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণামাতাজীর একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা nibodhatapatrika@gmail.com-এ মাতাজী সম্পর্কিত লেখা পাঠাতে পারেন।

* ২১ নভেম্বর ২০২৩ জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে নিবোধত কার্যালয় বন্ধ থাকবে।